বাংলা পত্রলিখন গ্রন্থের প্রথম পর্যায়

মাসুদ রহমান*

সারসংক্ষেপ: সভ্যসমাজের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ চিঠি। লিখন রীতি উদ্ভবের পর থেকেই মানুষের সামগ্রিক জীবনে এর ব্যবহার চলে আসছে। ব্যক্তিগত-সামাজিক-দাপ্তরিক ক্ষেত্রে চিঠির প্রচলন থাকার কারণে গঠন-প্রকৃতিতেও এসেছে নানা বৈচিত্র্য। যে-কারণে এককালে পত্রলিখন শিক্ষার বইপত্র বের হতো। ইদানীং নানা প্রযুক্তির প্রভাবে পত্রের ব্যবহার সংকুচিত হচ্ছে, তাই পত্রলিখন শিক্ষার বইয়ের প্রকাশনাও দেখা যায় না। তবে বাংলা বইয়ের প্রকাশনার ইতিহাসে সেটি একটি অধ্যায়, যদিও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা তেমন চোখে পড়ে না। ভাষার বিবর্তন শনাক্তকরণে পত্র হতে পারে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ, যার মাধ্যমে আরো পাওয়া যেতে পারে সামাজিক-ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির সূত্র। এসব উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বাংলা পত্রলিখন শিক্ষা বইয়ের প্রথম যুগের একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা অঙ্কন করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। পত্রের প্রকরণ-বৈচিত্র্য, প্রকাশনার প্রবণতা ও পরিণতি বিচার করে যুগসীমাটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ বাংলা পত্রবিষয়ক প্রথম বইয়ের প্রকাশের বছর থেকে ১৯০৩ সাল অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের লেখা প্রথম পত্রলিখন গ্রন্থের প্রকাশ পর্যন্ত। এ সময়পর্বে প্রকাশিত পত্রলিখন পুস্তকের তালিকা প্রণয়নের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদির পরিচিতি-পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

প্রবন্ধারম্ভ

পারিবারিক-সামাজিক জীবনে সম্ভবত লিখিত ভাষার প্রথম দরকার পড়ে পত্ররচনায়। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, কেউ যখন সমক্ষে নেই এমন ব্যক্তিকে নিজের বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে চাইল, তখন তৈরি হলো পত্র বা চিঠি। তাই কেজো বাংলা গদ্যের এ-যাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন একটি চিঠি। চিঠিখানা ১৫৫৫ সালে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ (রাজত্বকাল: ১৫৪০-৮৪) অহমরাজ চুকামফা স্বর্গদেবকে (রাজত্বকাল: ১৫৫২-১৬০৩) লিখেছিলেন। এরপর বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন বলতে যেগুলো উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলোর বেশির ভাগই পত্র কিংবা দলিল। দলিলও এক প্রকার দাপ্তরিক পত্র, যেখানে কিছু দাপ্তরিক ও পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়; এবং দাপ্তরিক বিষয় বলেই সেসব রচনায় সহজেই বা স্বেচ্ছায় পরিবর্তন আনা যায় না। এজন্য এখনও জমির দলিলে এমন কিছু শব্দ, শব্দসংক্ষেপ ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যগঠনেও এমন অনুশীলন দেখা যায়, যেগুলো

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

https://doi.org/10.62328/sp.v57i3.5

সাধারণ বাংলা গদ্যের রীতি-অনুগ নয়। ব্যক্তিগত পত্র সেদিক দিয়ে মানুষের কথার কাছাকাছি এবং তার ভাষা সাধারণ লিখিত গদ্যের সমান্তরাল। তাই ব্যক্তিগত পত্রের মধ্যে ব্যক্তির পাশাপাশি সমকালীন চিত্রও বিশেষভাবে লক্ষগোচর হয়। আবার ব্যক্তিগত-পারিবারিক বিধায় সময়ান্তরে তার বিবর্তন ঘটে, যা ভাষার বিবর্তনের সাথেও অঙ্গাঙ্গি জড়িত। তার পরও পত্ররচনা কিছুটা আনুষ্ঠানিক বিষয়। তাই এর গঠন-প্রণালি, রীতি-নীতি আছে যেগুলো নানা পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয়। পত্রলেখকও পত্ররচনার নির্দেশনার প্রয়োজন বোধ করতে থাকে। এসব কারণে পত্রযোগাযোগ যখন প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা পেল, তখন পত্রলিখনমূলক প্রকাশনার ব্যাপ্তি ঘটল। এর পর বিদ্যাশিক্ষা ও ব্যক্তিগত-সামাজিক ব্যবহারের প্রয়োজনে এবং প্রযুক্তির প্রভাবে পত্রশিক্ষার বইতেও দেখা গেল নানা ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পরিবর্তনশীলতা।

বিশেষ করে ব্যক্তিগত পত্রলিখনে পত্রলেখকের জ্ঞান-অজ্ঞতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সামাজিকতার কারণে কিছু প্রথা-প্রচল মানার পরও পত্রে নানান বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। পত্রলিখন গ্রন্থে তারও প্রতিক্রিয়া-সংকলন-সম্পাদন হয়ে থাকে। এ বিষয়গুলো ভাষা-সাহিত্য থেকে শুরু করে সামাজিক-রাষ্ট্রিক ইতিহাসের সাথেও অঙ্গাঙ্গি জড়িত। দাপ্তরিক পত্রের শুদ্ধতা ও ব্যক্তিগত পত্রের স্পষ্টতা বিধানের প্রয়োজনে এবং উভয়বিধ পত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পত্রলিখন পুস্তকের প্রয়োজন দেখা দেয় আধুনিক যুগের শুরু থেকেই। কিছুদিন আগেও শিক্ষার্থী ছাড়াও সাধারণের জন্যে শুধু পত্র বা চিঠি লেখা শেখানোর বই বের হতো। এ বইগুলো গভীরভাবে পাঠ করলে শুধু পত্রলিখনের বিবর্তনই নয়, বাংলা গদ্যের গতিভঙ্গিও নজরে আসবে। ব্যক্তিগত চিঠিতে থাকা সম্বোধন-সম্ভাষণ থেকে শুরু করে পত্রে বিধৃত প্রসঙ্গ ও তার বিবরণ ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজমানসকেও চিনিয়ে দেয়। এসব শনাক্তকরণের লক্ষ্যে আধুনিক বাংলা পত্রলিখন গ্রন্থের প্রাথমিক পর্বের একটি রূপরেখা আঁকা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

মূল সমাচার

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ডাকবিভাগ বা পাবলিক অফিস না থাকায় জনসাধারণের মধ্যে পত্রযোগাযোগ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। তাই এ-সময়ের বাংলা সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই পত্ররচনা শিখনের উপায় নিয়ে প্রবন্ধ বা পুস্তক বের হয়নি। তবে কাব্যসাহিত্যে পূর্ণ বা অংশবিশেষ পত্র সংযুক্ত হয়েছে। এসব পত্রের নামও ছিল বিচিত্র; যথা: কপট পত্র, জয় পত্র ইত্যাদি। পত্রের বিষয় বিবেচনায় এরকম নামকরণ। কিন্তু এগুলোর মধ্য দিয়েই পত্র রচনার একটি সূত্রধারা পাওয়া যায়। ধারণা পাওয়া যায় পত্রের প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে। এছাড়া পত্রলেখার নানা নির্দেশনাও লভ্য সে যুগের সাহিত্যে। যেমন: *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল* কাব্যে

বলা হয়েছে: 'প্রথমে লেখহ পত্র মান্যতা বিশেষ' (দোনা গাজী, ১৯৭৫: ৪৩৫)। পদ্মাবতী রাজা রত্নসেনকে যে পত্র লিখেছিল তা এরকম:

মহিমা লিখিয়া পূর্বে অনেক প্রণাম তবে
কুশল জানাই কিছু লেশ।
লিখি প্রেম অনুরাগ বিরহ বৈরাগ্য ভাগ
কার্য্য ভাগ জানাইল শেষ॥ (আলাওল, ২০০০: ৯৩)

এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ পত্র উদ্ধার করা যেতে পারে; *লায়লী-মজনু* কাব্য থেকে:

প্রণামহোঁ নিরঞ্জন ত্রিভুবন সার।
গোপত বেকত সব বিদিত যাহার॥
এতিন ভুবন মধ্যে যথ আদি অন্ত।
ভূত ভবিষ্যৎ যথ জানহ বিত্তান্ত॥
সভান মরণ গতি জানহ নিশ্চিত।
এতিন ভুবনে নাহি তোহ্মা অবিদিত॥
সত্যপাল করতার অসত্য সংহার।
দোষী বা নির্দোষ যথ করহ বিচার॥
শুন প্রভু শিরোমণি জীবের জীবন।
সহস্র প্রণাম করি তোহ্মার চরণ॥ (দৌলতউজির, ১৯৮৪: ২০৫)

মধ্যযুগের সাহিত্যে কাব্যারম্ভে কবি অনেকের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পেশ করতেন, দেখা যাচ্ছে পত্রারম্ভেও পত্রপ্রাপক ছাড়াও অনেকের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করত পত্রলেখক।

তবে এসব চিঠি বা তার অংশবিশেষ যুক্ত হয়েছে আখ্যানবর্ণনার প্রয়োজনে। একই কথা বলা চলে আধুনিক সাহিত্যকর্ম প্রসঙ্গে। হ্যানা ক্যাথেরিন ম্যলেন্স (১৮২৬-১৮৬১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) থেকেই কথাসাহিত্যে পত্র ব্যবহারের শুরু। প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যে পত্রকাব্যেরই প্রবর্তন করে গেছেন।

আধুনিক স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে 'পাঠশালা' পর্যায়েও বিভিন্ন বিষয়ের সাথে পত্রলিখন শেখানো হতো। তবে এসব পাঠশালায় লিখিত বা মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। আধুনিক যুগের সূচনা উনিশ শতকের শুরু থেকে — আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে বাংলা গদ্যের সূতিকাগার হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। এ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে ১৮০২ সালে বেরিয়েছিল চিঠি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বই — রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) রচিত *লিপিমালা*। এর মধ্য দিয়েই বাংলায় পত্রবিষয়ক বই প্রকাশের সূচনা। এর পর শতক জুড়ে বেশকিছু পত্রশিখন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এ-জাতীয় বই প্রকাশের প্রথম ১০২ বছর সময়পর্বকে প্রথম পর্যায় বলতে চাইছি। অর্থাৎ সীমারেখা টানতে চাই ১৯০৩ সালে — শেখ

মোহাম্মদ জমিরুদ্দিনের (১৮৭০-১৯৩৭) *বিশুদ্ধ খতনামা* অর্থাৎ মুসলমান রচিত মুসলমানদের জন্য কোনো পত্রশিখন গ্রন্থের প্রকাশ পর্যন্ত। এভাবে ধর্ম সম্প্রদায় বিবেচনায় আলোচনা করার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব, প্রাচীন-মধ্যযুগ থেকে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় প্রশস্তিবহুল পত্রের পর মুসলমান আমলে ফারসি তথা মুসলিম রীতিতে পত্র এল, এর পর ইংরেজ প্রভাবে বাহুল্যবর্জিত চিঠির প্রবর্তন ঘটল, আবার পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম রীতির পত্র বিকশিত হলো।

যাহোক, এসময়ের মধ্যে বেশ কিছু পত্রলিখন শিক্ষার বই প্রকাশিত হতে দেখা গেল। অসম্পূর্ণ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রাক্কাল থেকে ১৯০৩ সাল অবধি প্রকাশিত পত্রশিক্ষা পুস্তকের একটি নিম্নরূপ তালিকা আমরা করেছি:

রামরাম বসুর *লিপিমালা* (১৮০২); জন পিয়ার্সনের (১৭৯০-১৮৩১) *পত্রকৌমুদী* (১৮১৯); কৃষ্ণলাল দেবের *পত্রকৌমুদী* (১৮২০); জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের *পত্রের ধারা* (১৮২১); নারায়ণ চট্টরাজ ঠাকুর গোস্বামী গুণনিধির *পত্রচিন্তামণিগ্রন্থঃ* (১৮৪৫); রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জ্ঞানকৌমুদী* (১৮৫৮); রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের *বিজ্ঞানাঞ্জন* (১৮৬২); রাজেন্দ্রলাল মিত্র'র *পত্রকৌমুদী* (১৮৬৩); বিশ্বম্ভরচন্দ্র দাসের *পত্রমালা* (সিলেট, ১৮৭৯); প্রশান্তচন্দ্র বিদ্যারত্নের *পত্র লিখিবার পাঠ* (ষষ্ঠদশ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯০০); মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন *বিশুদ্ধ খতনামা* (১৯০৩)।

একশ বছরে এগারটি বই আপাত দৃষ্টিতে স্বল্পসংখ্যক মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে আরো কিছু বিষয় বিবেচ্য। প্রথমত, সেকালে প্রকাশনার পরিমাণ অনিবার্যভাবেই কম ছিল। দ্বিতীয়ত, আজ দু'শ বছরের ব্যবধানে সমস্ত তথ্য উদ্ধার অসম্ভব। তবে এগুলোর বাইরে জেমস লঙের (১৮১৪-১৮৮৭) প্রথম অর্থাৎ ১৮৫২ সালের গ্রন্থতালিকায় (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ১৯৮৫: ৪-২৩) বেশ কয়েকটি চিঠিলেখার বইয়ের কথা জানা যায়। 'শ' অর্থাৎ শব্দশাস্ত্র বিভাগের সংশ্লিষ্ট বইগুলো হচ্ছে: *পত্র-কৌমুদী*, *পত্র কৌমুদী চিন্তামণি*, *পত্র কৌমুদী ধারা*, *প্রশস্তি পত্রিকা*, *লিপি মালা*। লঙের অন্যান্য গ্রন্থতালিকা, বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত বাংলা মুদ্রিত বইয়ের তালিকা ও অন্যান্য সূত্রে আরো কিছু গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। যেমন, রাজনারায়ণ দাসের *লিখন-পত্র-দলিল-শিক্ষা* গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ রক্ষিত আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বইটির সপ্তম সংস্করণ বের হয় ১৯০৭ সালে — ধারণা করা যায়, উনিশ শতকেই এর প্রথম প্রকাশ ঘটে। পরিচিতিতে লেখা আছে A Bengali Primer with x letter-writer and specimens of zamidari documents and account. (Blumhardt, 1910: 216). হরনাথ ঘোষের *পত্র-দলিল শিক্ষার* নবম সংস্করণ বের

হয় ঢাকা থেকে ১৯০৭ সালে (Blumhardt, 1910: 89); কাজেই এটিও উনিশ শতকেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। বিশ্বম্ভরচন্দ্র দাসের *পত্রমালা* প্রথম সিলেট থেকে বের হলেও এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮২ সালে ঢাকা থেকে বের হয়। । এভাবে আরও কিছু বই প্রকাশিত হয়ে থাকবে। এসব তথ্য থেকে সেকালে চিঠিপত্র শেখার বইয়ের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

চিঠিপত্রের বই সাহিত্যশিল্প নয়, ব্যাবহারিক প্রয়োজনের গ্রন্থ। এ প্রয়োজন সময়ান্তরে কমেও যায়। তাই সেকালে স্বল্প সময়ে অনেকগুলো ও হাজার হাজার কপি বের হওয়া এসব বইয়ের বেশির ভাগ অধুনা দুষ্প্রাপ্য। আমরা কয়েকটির জীর্ণ-কীটদষ্ট কপির অনুলিপি সংগ্রহ করতে পেরেছি। এগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট ও সেকালে জনপ্রিয় কয়েকটি বইয়ের বিবরণ ও বিশ্লেষণ প্রদানের পূর্বে আদিতম গদ্যের নিদর্শন অহমরাজের চিঠিখানি এবং পত্রলিখন শিক্ষার বই না হলেও বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ ন্যাথালিয়েন ব্রাসি হ্যালহেডের (১৭৫১-১৮৩০) ব্যাকরণ গ্রন্থে মুদ্রিত একটি পত্র আমাদের পুরোপুরি উদ্ধৃত করতে হবে। এর ফলে পত্রলিখনের উৎস ও বিবর্তন শনাক্ত সহজ হবে। প্রথমে অহমরাজ-বরাবর কোচবিহারের রাজার চিঠির মূল অংশ উদ্ধার করি:

> লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। (আনিসুজ্জামান, ১৯৮৪: ৭৩)

চিঠি চালাচালি হলে যে প্রেরক-প্রাপক 'উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত রহে' পত্রের এ কার্যকারিতার কথা এখানে উল্লিখিত। এছাড়া শুরুতে কুশল জিজ্ঞাসা আর শেষে 'অধিক কি' — এ ভঙ্গি তো একালেও চিঠিতেও দেখা যায়। এটির ভাষা প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান বলেন:

> এই অংশে প্রথমে চোখে পড়ে আঞ্চলিক প্রভাব; তারপর লক্ষ করা যায় যে, এর বাক্যের গড়ন একরকম নয় — কোথাও তা স্বল্পপরিসরের, কোথাও তা দীর্ঘ। ছোট বাক্য সহজ ও প্রত্যক্ষ; দীর্ঘ বাক্য অলংকৃত এবং একটু কৃত্রিমও বটে। এ-সত্ত্বেও এ ভাষায় সারল্য আছে, তা স্বীকার করতে হয়। (আনিসুজ্জামান, ১৯৮৪: ৭৪)

কথাটি বলা হয়েছে চিঠির 'মূল' অংশ দেখে; এটির 'মুখ' বা সম্ভাষণ অংশ দেখে নিই এবার:

> স্বস্তি সকল দিগ্‌দন্তিকর্ণতালাস্ফাল সমীরণ প্রচলিত হিমকর হর হারহাসকাশকৈলাস পাণ্ডুর যশোরাজিবিরাজিত ত্রিপিষ্টপত্রি দশতরঙ্গিনীসলিলনির্ম্মল পবিত্রকলেবর

> ধীষণধীরধৈর্য্য মর্য্যাদাপারাবার সকলদিক্কামিনী গীয়মান গুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রচণ্ডপ্রতাপেষু (আনিসুজ্জামান, ১৯৮৪: ৭৪)

এ অংশে ভাষারীতি এতটাই ভিন্ন যে, ভিন্ন ভাষার মানে সংস্কৃত ভাষার রচনা এবং ভিন্ন সময়ের লেখা বলে মনে হওয়া সম্ভব। 'মূল' ও 'মুখ' অংশের এ ভিন্নতা, মূল অংশের সরলতা দেখে পুরো চিঠিখানির প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ করেছেন কেউ কেউ। তবে আমরা একটু পরেই দেখব, এরকম সম্ভাষণ যাকে বলে প্রশস্তি, তার চর্চা আমাদের আলোচ্য সময়েও প্রায় একই রকম ছিল। এসব প্রশস্তি প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-১৮৯১) বলেছেন:

> বোধ হয়, পূর্ব্বকালের পত্রে কেবল জ্ঞাতব্য কথামাত্র লিখিত থাকিত; সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বা তুল্য ব্যক্তির ইতরবিশেষ জ্ঞাপনার্থে পাঠাপাঠের নির্দ্দেশ হয়, এবং তাহাই 'প্রশস্তি' নামে বিখ্যাত। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালাবধি এই প্রশস্তির বিশেষ পর্য্যালোচনা আছে এবং তদ্বিষয়ক অনেক গ্রন্থও প্রচলিত দেখা যায়। (রাজেন্দ্রলাল, ১৯০৪ : ভূমিকা)

যাহোক, হ্যালহেডের গ্রন্থটি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ বটে, তবে তা ইংরেজি ভাষায় রচিত। এখানে উদাহরণ হিসেবে বাংলায় শব্দ-বাক্য-পদ-রচনাংশ বাংলা হরফেই মুদ্রিত হয়েছে। বাংলা চিঠিখানির আবার ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া আছে। খাঁটি অর্থাৎ বাংলা পত্রখানি পড়া যাক:

> গরিবনেওয়াজ শেলামত
>
> আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিশ্‌তী হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পয়শতী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরী আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোড় করিতেছে আমি মালগুজারিশরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবণ।
>
> ফিদবি
> জগতধির রায়
> (Halhed, 1778 : 209)

রচনাকালের কারণে অনিবার্যভাবেই এখানে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ষোড়শ শতকের চিঠিখানি প্রেরক-প্রাপক দুই রাজ্যের রাজা হলেও তা অনেকটা ব্যক্তিগত-পত্র। হ্যালহেড-সংকলিত পত্র সম্পূর্ণরূপে দাপ্তরিক, তাই হয়তো প্রশস্তি অংশ সামান্যই। হ্যালহেডের ব্যাকরণ বইতে চিঠির নমুনা থাকলেও বাঙালি রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ অর্থাৎ রামমোহন রায়ের *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩)-এ তা নেই। হতে পারে, সেসময় প্রয়োজনের খাতিরে চিঠিপত্রের আলাদা বই বের হচ্ছিল বলে রামমোহন তাঁর ব্যাকরণে চিঠি অন্তর্ভুক্ত করেননি।

রামরাম বসুর *লিপিমালা* (১৮০২)

গ্রন্থটির পরিচয় দিতে গিয়ে একাংশে লেখক বলেছেন:

> এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গ দেশ কার্য্য ক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাঁহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজ ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে ভূমীয় যাবতীয় লেখা পড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপি মালা নামক পুস্তক রচনা করা গেল। (রামরাম বসু ১৮০২: ৩-৪)

দুই ধারাতে ৪০টি চিঠি উপস্থাপনের পর ২৫৫ পৃষ্ঠার শেষ ১৫ পৃষ্ঠায় 'অঙ্কমালা' নামে একটি অংশ আছে যেখানে মূলত নানা রূপ গণনা শেখানো হয়েছে। তবে *লিপিমালা* খাঁটি পত্রলিখন শিক্ষার গ্রন্থ কিনা তা নিয়ে যে কিছুটা তর্ক আছে, তা শুধু ওই অংশের কারণে নয়। আখ্যাপত্রে লেখা ছিল: A STORY OF LETTERS ON DEFFERENT SUBJECTS. অনেকগুলোতেই পত্রাকারে নানা পৌরাণিক-কিংবদন্তি-কাহিনি বিবৃত করা হয়েছে বটে, কিন্তু বেশ কিছু চিঠির প্রায় পুরো অংশই ব্যক্তিগত-পারিবারিক প্রসঙ্গ এবং গঠন কাঠামো পরিপূর্ণভাবে চিঠিরই বটে। বিশেষভাবে বিবেচ্য এই যে, রামরাম বসু মুনশি ছিলেন, তাঁর প্রথম বই *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১)-এ অধিক পরিমাণে ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল। একদিকে রামরাম বসুর মতো মুনশির ফারসিপ্রীতি, অপরদিকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো পণ্ডিতদের সংস্কৃতানুসারী রচনার প্রভাবে বাংলা গদ্য শুরুতেই আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হয়ে উঠেছিল বলে অনেকেরই মত। তবে *লিপিমালা*র পত্রগুলোতে যে পরিমাণ সংস্কৃত শব্দাবলি ব্যবহৃত ও ভাষারীতি অনুসৃত তা বিস্ময়কর। এতে মনে হয়, মূলত প্রচলিত চিঠির মূলানুগ উদাহরণ দিতে গিয়েই এমনটি হয়েছে।

প্রথম ধারায় এক রাজা অন্য রাজাকে লিখেছে এমন ১০টি ও রাজা চাকরকে লিখছে এমন ৫টি চিঠি রয়েছে। দ্বিতীয় ধারার ২৫টি চিঠির মধ্যে আছে পুত্র পিতাকে ও পিতৃতুল্য সমস্তকে ৩টি, গুরু লঘুকে ৬টি, লঘু পোষ্য গুরুকে ৩টি, গুরু প্রতিপালক লঘুকে ১টি, গুরু প্রতিপালক গুরুকে ১টি, গুরু প্রতিপালক লঘুকে ১টি, পিতা পুত্রকে এবং পুত্রতুল্য সমস্তকে ২টি, সমান বয়োধিক সমানকে ১টি, সমান সমানকে ১টি, মনিব চাকরকে ১টি, চাকর মনিবকে ১টি, মনিব সামান্য চাকরকে ৩টি চিঠি। একালের পাঠ্যপুস্তকে দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের বিবরণ, ঐতিহাসিক বা জাতীয় দিবসের গুরুত্ব বিষয়ে পিতা পুত্রকে কিংবা বড় ভাই ছোট ভাইকে চিঠি লেখার যেসব উদাহরণ থাকে, প্রথম ধারায় চিঠিগুলো পড়লে মনে হয় যেন *লিপিমালা* সেগুলোরই পথিকৃৎ পুস্তক। আর ব্যক্তিগত-দাপ্তরিক চিঠিগুলো নিঃসন্দেহে সেকালের সামাজিক তথ্যাদির প্রামাণিক পত্র।

লিপিমালার বিভিন্ন পত্রের সম্ভাষণের কয়েকটি উদাহরণ:

গুরু প্রতিপালক লঘুকে: 'অনন্যগতিক পোষনীয়স্য পরম শুভা শিষ্যাং রাশয় সন্তু নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ।' (রামরাম বসু, ১৮০২: ২০০)

সমান বয়োধিক সমানকে: 'নমস্কারা নিবদনঞ্চ বিশেষঃ আপনার মঙ্গলাদি সতত কামনীয় তাহাতে অত্রানন্দ পরৎ।' (রামরাম বসু, ১৮০২: ২০৩)

পুত্রকে ও পুত্রতুল্য সমস্তকে: 'পরম কল্যাণবর শ্রীযুত অমুক পরম কল্যাণবরেষু।' (রামরাম বসু, ১৮০২: ২০৭)

সমাপ্তিতে লেখা হচ্ছে: 'কিমধিকমিতি', 'নিবেদনমিতি', 'ইতি' ইত্যাদি। তবে সমাপ্তিতে প্রেরকের পরিচয় নেই। কারণ এ হতে পারে যে, ঠিক পত্রলিখন শিক্ষার বই হিসেবে এটি রচিত হয়নি; পত্র আঙ্গিকে বিভিন্ন বিষয় ও কাহিনির অবতারণা করা হয়েছিল। তবে চিঠিপত্র লেখার বিধি বা নিয়মের উল্লেখ না থাকলেও নমুনার কারণে বাংলা পত্রলিখন গ্রন্থধারার প্রথম বই হিসেবে *লিপিমালার* মর্যাদা স্বীকার করতেই হয়। 'পরমব্রহ্ম' ও কিছু সম্ভাষণসূচক শব্দ এবং রামরামের পূর্ববর্তী গ্রন্থের তুলনায় ভাষা কিছুটা উন্নত বিধায় কেউ কেউ এটি রচনা-সংকলনে রামমোহনের অবদান আছে বলে দাবি করলেও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনের বয়সের ব্যবধান ও বাংলা লেখালেখির সময়পর্বে বিবেচনায় কথাটি সত্য নয় বলে প্রমাণ করেছেন। তিনি *লিপিমালার* ভাষার 'সরলতা' ও 'অসাধারণ উন্নতির' পিছনে 'কেরির নির্দেশে'র কথা বলেছেন (অসিতকুমার, ১৯৭৮: ৪১); আমরা মনে করি এ উন্নতির আরেকটি কারণ, এগুলো চিঠি বলেই। সবমিলিয়ে পত্র শিখন ও গদ্যভাষার উন্নয়ন – এ দ্বিমুখী কাজ করেছে *লিপিমালা*।

জন পিয়ার্সনের *পত্রকৌমুদী* (১৮১৯)

চুঁচুড়ার মিশনারি স্কুলের শিক্ষক জে ডি পিয়ার্সন (১৭৯০-১৮৩১) সম্ভবত সেকালের অন্যতম অধিকসংখ্যক স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের রচয়িতা। *নীতিকথা*, *বাক্যাবলী* (১৮২৫), *পাঠশালার বিবরণ* ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়াও অভিধান সংকলন করেছিলেন। *পত্রকৌমুদী* তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ। লিপিমালার মতো এটিও শুধুই চিঠি সংকলন নয়, গ্রন্থের শেষে 'অভিধান' অধ্যায়ে ৩৫৮টি শব্দ ও অর্থ দেওয়া আছে। স্কুল বুক সোসাইটির এ বইটির প্রতি সংস্করণে কয়েক হাজার করে কপি ছাপা হতো। সংস্করণগুলোতে কিছু কিছু পরিবর্তনও আসছিল। বস্তুত পূর্বতন রীতির ধারাবাহিকতায় ইংরেজি রীতিতে আধুনিক পত্রশিক্ষার কার্যকর বই হতে পেরেছিল এটি। ১৮৫২ সালে এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ বেরিয়েছিল বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে (https://granthsouthasia.wordpress.com/sct/stc-p/ ২২.০৪.২০২২)।

নানা সূত্রে পিয়ার্সনের *পত্রকৌমুদীর* জনপ্রিয়তা, মান ও প্রকাশনার তথ্য পাওয়া গেলেও আমরা মূল বইটি দেখতে পারিনি। লেখকের আরেকটি বিখ্যাত বই *বাক্যাবলী*; এ পুস্তকের শেষ অধ্যায়টি ছিল: 'দরখাস্ত ও পত্র ও রসীদ প্রভৃতি লিখিবার ধারা'। মূলত ইংরেজিতে লেখা পত্রের নমুনা দেওয়া হয়েছে এরপর সেসব পত্রের বঙ্গানুবাদ। লক্ষণীয়, অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে আক্ষরিক নয়। বাংলা পত্র লেখার আদর্শ মতে সেগুলোর অনুবাদ করা হয়েছে। এরই একটি নিচে তুলে ধরা হলো:

Shalumpore, April 8,1820.
SIR,

I am favoured with yonr's of the 1st instant, requesting me to forward the Shalumpore cloth. On the 30th ultimo, I forwarded, by two shipments, 400 bales, the invoice of which by this time you will have received. The rains are not yet ower: on being examined, should any of the cloth be found damaged, and be returned upon your hands, please send it back immediately by these boats. If you delay, there will not be water sufficient in the river, and sending by land carriage will be a heavy expense.

I note also you have written for wax. Here are 200 maunds ready; in four or five days I shall receive 500 more: on their arrival, I shall forward the whole.

Silk I have not purchased. It does not appear advise able to buy at present, as I hear there are large importations westward.

I am happy to say allare wellhere—andam,

- * SIR,
Your obedient Servant,
Kristno Gobindo Debshorma.
(পিয়ার্সন, ১৮২৫: ২৬৮)

বাংলা পত্রটি নিম্নরূপ:

আজ্ঞাকারি প্রতিপাল্য শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ শ্রীযুত বাবুজীউ মহাশয়ের রাজোন্নতি শ্রীশ্রী স্থানে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি তাহাতেই আত্রানন্দঃ পর° ১ এপ্রেলের আজ্ঞাপত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম. শালমপুরী কাপড় পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন. ৩০ মার্চ্চ দুই কিস্তিতে ৪০০ গাঁইঠ কাপড় পাঠাইয়াাছি, এত দিবস চিঠী পহুছিয়া থাকিবেক. এক্ষণে বর্ষাকাল, দাগী চিতী হইয়া খাতার দ্বারা যদি কিছু ফিরত হয়, শীঘ্র এই নৌকাতেই পাঠাইবেন, গৌণ হইলে নদীতে জল থাকিবেক না; বলদ করিয়া পাঠাইতে হইলে খরচ অধিক হইবেক.

পরে মোম কিছু পাঠাইতে লিখিয়াছেন, ২০০ মোন এখানে তইয়ার আছে, আর চারি পাঁচ রোজ ৫০০ মোন আসিবেক, আইলেই পাঠাইয়া দিব.

চেলির কাপড়ের এবার সূগোচ [সুযোগ] বুঝিলাম না, এ কারণ খরিদ করিলাম না, শুনিতে পাই দক্ষিণ অঞ্চলে বিস্তর আমদানী, কি প্রকারে খরিদ করিব.

এখনকার সমাচার আরং সকল মঙ্গল জানিবেন, ইহা নিবেদন করিলাম, ইতি সন ১৮২০শাল ৮ এপরেল.

(পিয়ার্সন ১৮২৫ : ২৬৯)

জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের *পত্রের ধারা* (১৮২১)

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত *পত্রের ধারা* গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাদরি লঙের পুস্তকতালিকার ২২৫ ক্রমিক মতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটির রচনাকার জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫-১৮৪৬) (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয়, ১৩৪৯ব.: ১২)। আমরা গ্রন্থটির ৪র্থ মুদ্রণ (১৮৪৫ খ্রি.) পেয়েছি, সেটিতেও লেখকের নাম নেই। এ বইয়েও পত্র-অতিরিক্ত প্রসঙ্গ ছিল। আখ্যাপত্রেই লেখা ছিল: '*পত্রের ধারা* অর্থাৎ পাঠাপাঠ ও পাট্টা ও কবুলিয়ত ও দরখাস্তপ্রভৃতি ও শুভঙ্করের আর্য্যা ও ভাষার সহিত চাণক্যের শ্লোক'; ইংরেজি নাম *The Bengalee Letter-Writer*. 'নির্ঘণ্ট' শিরোনামে সূচিপত্র নিম্নরূপ:

শুভঙ্কর কৃতার্য্যা, সেবক পত্র, আজ্ঞাকারী, আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী, সেবকানুসেবক, ভবদীয়, পোষ্য, ত্বদীয়, শুভার্শ্বঃ, নিত্যাশীর্ব্বাদক, ফরমারবরদার, শুভানুধ্যায়ী, স্বস্তিসেবিকা, পরম শুভাশীঃ, জমীদার প্রজালোককে লিখে, অনুপেক্ষণীয়, অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, ফৌজদারী দরখাস্ত, মুচ্লকা, এলেমনামা, এক্তিয়ারনামা, কবুলতি, পাট্টা, দেওয়ারী দরখাস্ত, কবালা, একরারনামা, লগ্নপত্র, রুব[জু?]কারী, খারীজ দরখাস্ত, হুকুমনামা, সনন্দপত্র, উসিনামা. বয়নামা, দানপত্র, ব্রহ্মোত্তরপত্র, ধান্যের খত, নিমন্ত্রণ পত্র ও রসীদ, জামিনীপত্র, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র, টাকার খত, চালান ও দাখিলা, শুভপুণ্যাহের চিঠী ও তলবচিঠী, হেবানামা, চাণক্য কর্তৃক সংগৃহীত নীতিগ্রন্থ সারসংগ্রহ।

'শুভঙ্করের কৃতার্য্যা' শিরোনামে পদ্যবন্ধে পত্র লেখার কিছু নিয়ম বলা হয়েছে। যথা:

শ্রীগুরুচরণপদ্ম বন্দিয়া মস্তকে।
পত্রের নিয়ম কিছু কহিব সংক্ষেপে॥
পিতামহ মহাশয়ে করিয়া প্রণতি।
সেবকানুসেবক বলিয়া লিখে পাতি॥
পিতা জ্যেঠা খুড়া আদি যত সমতুল।
জ্যেষ্ঠ মধ্যম আর শ্বশুর মাতুল॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত গুরু জন।
পরমপুজনীয় বলি দিবে শিরনাম।

পত্রের নিয়ম এই স্থির করিলাম॥
ছোট ভাই পুত্রাদি ভাগিনা যত থাকে।
পরম শুভাশী বলি পত্র লিখে তাকে॥
মঙ্গল উন্নতি করি লিখিবে আশিষে।
পরমকল্যাণীয় বলি শিরনামা শেষে॥
পুত্র নাহি বনিতা স্বামিকে লিখে পাতি।
স্বস্তি সেবিকা বলি লিখিবে যুবতি॥
মহামহিম বলি শেষে দিবে শিরনামা।
পত্র লিখিবার রীতি শুন সর্ব্ব জনা॥

এবারে পত্রনমুনা চয়ন; পত্রের (পুত্র পিতার বরাবর) আরম্ভ অংশের কিছুটা নিচে দেওয়া হলো:

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।
পরমপূজনীয় শ্রীযুত পিতা ঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণ কমলেষু।
সেবক শ্রীনীলকমল দেবশর্ম্মণঃ (জয়গোপাল, ১৮৪৫: ৩)

দেখা যাচ্ছে প্রাপকের পরপরই প্রেরকের নাম রয়েছে। সমাপ্তি টানা হয়েছে তারিখ দিয়ে:

লিখিতে আজ্ঞা হইবেক ইহা শ্রীচরণে নিবেদনমিতি
তাং ৫ কার্ত্তিক সন ১২২৭ সাল। (জয়গোপাল, ১৮৪৫: ৩)

বাংলায় প্রথম দিকের নকশা ও উপন্যাসে এই রীতির নমুনা দেখা যায়।

রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জ্ঞানকৌমুদী* (১৮৫৮)

প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশকের বাইরে ব্যক্তি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন যেসব প্রকাশক সেসময় পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষণীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল সেগুলোর মধ্যে আহিরীটোলার মধুসূদন শীলের চৈতন্যচন্দ্রোদয় অন্যতম। পত্রশিখনের একাধিক বই বের হয়েছিল এখান থেকে। বইটি বের হয় ১৭৮০ শকাব্দ তথা ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। আখ্যাপত্রে নিম্নরূপ লেখা ছিল:

শ্রীশ্রী গুরুদেবের পিতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের ও পিসিরকুলের
মেসোরকুলের ইত্যাদি সমস্ত কুলসম্পর্কীয় শ্রেষ্ঠ
কনিষ্ঠ বিবেচনা পূর্ব্বক এবং স্ত্রীলোককে
স্ত্রীলোক পত্র লিখিবার ধারা।

বিচিত্র সব প্রেরক-প্রাপকের মধ্যে পত্রালাপের নমুনা দেওয়া ছিল। কয়েকটি এরকম: 'মুসলমান শিক্ষাগুরুকে চাতুর্ব্বিধ জাতি ছাত্রের পত্র', 'চাতুর্ব্বিধ জাতি ছাত্রকে মুসলমান শিক্ষাগুরুর পত্রলিখন', 'মুসলমান শিক্ষাগুরুকে চাতুর্ব্বিধ জাতি

স্ত্রীলোক ছাত্রের লিখিবার ধারা', 'চাতুর্ব্বিধ জাতি স্ত্রীলোক ছাত্রকে মুসলমান শিক্ষাগুরুর লিখিবার ধারা', 'ব্রাহ্মণ রাজাকে মুসলমান প্রজার লিখিবার ধারা', 'মুসলমান প্রজাকে ব্রাহ্মণ রাজার লিখিবার ধারা' ইত্যাদি।

বিভিন্ন ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কেও মানুষদের বরাবরে লেখা ব্যক্তিগত পত্রের পাশাপাশি বয়নামা, তালুকদারের দখলি, ইজাদ্দারের কবুলতি, ইজাদ্দারের সনন্দ, ইজারদারের দখলি, ইজারদারের মালজামিন, শুভ পুণ্যাহের চিঠি, তালুকদারের খাজানার দাখিলা, খাজানা বাকীর কারণ তালুকদারের পর তলব চিঠি: এসব পত্রপাঠে তখনকার সময়ের সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে অধিক হারে যুক্ত ঘটনাবলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। দাপ্তরিক চিঠিগুলোতে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সে তুলনায় ব্যক্তিগত পত্রে প্রশস্তি, সম্ভাষণসহ সৌজন্যমূলক অংশে সংস্কৃতজ শব্দের ব্যবহার বেশি।

নারায়ণ চট্টরাজ ঠাকুর গোস্বামী গুণনিধির *পত্রচিন্তামণিগ্রন্থঃ* (১৮৪৫)

নারায়ণ চট্টরাজ ঠাকুর গোস্বামী গুণনিধি *পত্রচিন্তামণিগ্রন্থঃ অর্থাৎ গুর্ব্বাদি নানা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদিগকে পত্র লিখিবার ধারা* গ্রন্থটি ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যয়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) সমাচার চন্দ্রিকা ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থে উল্লেখিত প্রকাশকাল ১৭৬৭ শক, ৯৫ দানিশাব্দ। বইটির প্রথমে আছে 'মঙ্গলাচার বিজ্ঞাপন' তার পর 'ভুমিকা'। এটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে ভূমিকায় মুসলিম শাসনের প্রতি বিষোদগার করা হয়েছে; অংশবিশেষ:

> কলিযুগারম্ভাবধি নিরবধি কতিপয় বর্ষ পর্য্যন্ত নিতান্ত পুণ্যপ্রসতি ছিলেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে মদ্যপানাদিনিরত পরহিংসাদিদুরিতপরিপুরিত ঘোরতর যবন নৃপগণ ভারাক্রমণে [ভারতাক্রমণে?] ধরণী রোরুদ্যমানা হওয়াতে তচ্ছসনানুষ্ঠান পরায়ণ ভদ্রসন্তানগণ সঘন স্বধর্ম্ম পরিশীলন পরাঙ্মুখ হইয়া জঘন্য যবন বিদ্যাভ্যাস করত সতত তদ্ভাষা ভাষণ হেতু স্বজাতীয় সদ্ভাষা বিস্মৃত হইবাতে যবন প্রায় দুর্নিবার দুরাচার হইয়া ছিল সংপ্রতি ইংলণ্ডাধিপতি মহামতি নৃপতিশাসনে তাহা প্রায় অবসান হইতেছে ইত্যবসরে পরোপকৃতিকৃতজ্ঞ বিজ্ঞ গণ স্বীয়২ সৌজন্যতা প্রকাশ করত পাঠাপাঠাদি প্রমিত নানা মত পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহাতে কৃচিৎ কৃচিৎ সাধু মিশ্র ভাষ ও কৃচিৎ দুরূহ প্রাচীন রীতি প্রকাশ ইহাতে ইদানীন্তন বালক সকলের তদবলোকনে অসন্তুষ্টিতা প্রযুক্ত নব্যরীতি যুক্ত এই পুস্তক রচনা করিতেছি সাধুজন সমবলোকনদ্বারা ভ্রম প্রমাদাদি জন্য যদ্যপি কোনস্থান সদৃষ্ট থাকে তাহা স্বীয় সুষ্ঠুবুদ্ধিতে সংশোধন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বস্বদেশীয় সদাচারানুরূপ যথাযোগ্য পাঠাদি লিখিবেন ইহাতে পত্রভঙ্গাদিক্রম বিশেষ লিখিত হইল না যাঁহার দৃষ্ট্যাবশ্যক হয় তিনি পত্রকৌমুদ্যাদি প্রাচীন পুস্তক অথবা বিজ্ঞানাঞ্জনাদি তৎগৃহীত নব্য পুস্তকে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন কিমলম্পল্লবিতেনেতি। (নারায়ণ, ১৮৪৫: ২-৩)

প্রশস্তি ও পত্রীপাঠ শিরোনামে বিভিন্ন প্রাপকের বরাবরে চিঠির দুটো অংশের নমুনা দেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে গুরুর প্রতি লিখিত তিনটি পত্রের উদাহরণ দিয়ে। এর পর রয়েছে গুরুপত্নীর প্রতি দুটি এবং গুরুপুত্র বরাবর দুটি, তার পর শিষ্য পিতামহ পিতা পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ভগিনীপতি শ্যালক, অগ্রজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পৌত্র বৈবাহিক পতি পত্নী বন্ধু রাজ সামান্য রাজ, মন্ত্রী, মন্ত্রীর প্রতি রাজা, পুরোহিত, পণ্ডিত সন্ন্যাসী, প্রেমতত্ত্ব বিষয়ে পত্র ও পত্রোত্তর। শেষের দিকে যথারীতি দাপ্তরিক, আইনি ও বিবিধ বিষয়ের চিঠি সংকলিত। যথা: বিষয়াধিকার, অঙ্গীকার, লগ্নক (নিয়োগ বা মাল জামিন প্রদান), 'পত্তনীর অধিকারপত্র বা বয়নামা', স্বত্বদান পত্র, ইজারার অধিকার পত্র, 'ঋণপত্র অর্থাৎ তমঃসুক' 'ভূমি বিক্রয়পত্র অথবা কোবাল'।

রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্যর *বিজ্ঞানাঞ্জন* (১৮৬২)

নদীয়ার মাজিদহনিবাসী রাজনারায়ণ এটি রচনা করে গেলেও তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। রাজনারায়ণও মুসলমান শাসকের প্রতি বিরাগ ও বিপরীতে বর্তমান শাসনের প্রতি অনুরাগ পোষণ করেছেন। লিখেছেন:

> এই ভারতবর্ষ নামক পুণ্যভূমি সৃষ্টিকালাবধি সাধুস্বামিসমূহের শাসনাধীনা প্রযুক্ত অন্য বর্ষাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে সদসদ্বিচার, ব্যবহার-বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, ধর্ম্মে গরিষ্ঠা। এবং স্বীয় সন্তান সকলের সর্ব্বাভীষ্ট সাধিকা ছিলেন, বিধিবশাদ গত সহস্রৈকাব্দাভ্যন্তরে দেব-দ্বিজদেষ্টা যবনগণের উক্ত রাজ্যাধিকৃত হওয়া পতঃপরতঃ অহিতাচারে ধরিত্রীতল কম্পিতা হইয়াছিল যৎ স্মরণে অস্মদাদির অদ্যাপি হৃৎকম্প হয়। অনন্তর পাপশাস্তা পরমেশ্বর পাপভাজন যবণগণকৃতাহিতবশতঃ স্বকোপানলে দুরাত্মাগণে দগ্ধীভূত করত উক্ত রাজ্য ধার্ম্মিক পার্থিবহস্তে অর্পণ পুরঃসর প্রজা সকলকে সর্ব্ব ভয় হইতে বিমুক্ত করিয়াছেন, যাদৃশ প্রতপ্ততপনতাপেসন্তাপিত পথিকেরা বর্ত্মোপরি নিবিড় নির্ম্মল ছায়ান্বিত তরুতলে তৃপ্ত হয়েন তাদৃশ হিন্দুস্থানীয় ক্ষীণ দীন হিনউ প্রজাগণ দিন ২ ভয় বিহীন হইয়া বিদ্যা বৃদ্ধি বিভবে বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে। বর্ত্তমান রাজ প্রযত্নে অস্মদ্দেশে যে প্রাগুক্ত যবনজাতিদের জঘন্য বিদ্যা ও ভাষা প্রচলিতা ছিল তাহা ক্রমশঃ অবসান হইতেছে। (রাজনারায়ণ, ১৮৬২: ২-৩)।

লেখকের মতে, এ সহায়ক পরিস্থিতিতে অনেকেই এখন পূর্বকালের মতো সংস্কৃতরীতিতে পত্রশিক্ষার বই লিখছেন বটে, তবে 'পূর্ব্বকালে লিপ্যাদির নিয়ম' নাকি সেসব বইতে ছিল না। সেকারণেই 'যথাসাধ্য সংস্কৃত ও কোমল সাধুভাষায় গদ্যছন্দে পদবিন্যাসপদবিন্যাসপূর্ব্বক স্বভাষায়' গ্রন্থটি রচনা করেছেন বলে রাজনারায়ণের দাবি। এ দাবিমতে আমরা দেখি, আদিকালের সংস্কৃত পত্রাবলির নিয়মানুযায়ী চিঠির কাগজের রং, চিহ্ন প্রদান, কোন থেকে পুরো পৃষ্ঠার ভাঁজ করা ইত্যাদি বিষয়েও নির্দেশনাযুক্ত করেছেন। এসব নিয়মের অনেককিছুই বাংলায় অন্তত সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। এমনকি পত্রপ্রসঙ্গও অনেকসময় দুর্বোধ্য ও অবান্তর লাগে। একজন সমালোচক বলেছেন, "বিজ্ঞানাঞ্জন'-এ নায়ক নায়িকার

আদর্শ পত্রের যে নমুনা দেওয়া হয়েছে আজকের দিনে তা নেহাৎই অচল" (সুপ্রসন্ন, ১৩৬৩: ৪); আমাদের মনে হয় সে যুগেও অন্তত বাংলাদেশে তা প্রচলনের বাস্তবতা ছিল না। কারণ এসব চিঠি একান্তই সংস্কৃত চিঠির অনুবাদ বা অনুকরণ। তবে চিঠি প্রস্তুতকরণ ও লিখনে তিনি যে কত বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত করেছিলেন, তা জানার জন্যে আমরা সূচিপত্র পুরোটাই তুলে ধরতে চাই — সেখানে আরো লক্ষগোচর হবে যে, অধ্যায় বিভাজন ও নামকরণেও তিনি পরম সংস্কৃতানুগ থেকেছেন।

প্রথম কোষ্ঠে প্রথম পরিচ্ছেদ:

মঙ্গলাচরণ, ভূমিকা, অনুক্রমণিকা, প্রতিজ্ঞা, পত্র রঞ্জন, পত্র ভঙ্গ, পত্র চিহ্ন, রাজপত্র কোণচ্ছেদন প্রকার, মহিষী পত্র চ্ছেদন প্রকার, মন্ত্রিপত্র চ্ছেদন প্রকার, স্বামিপত্র চ্ছেদন প্রকার, ভার্য্যাপত্র চ্ছেদন প্রকার, গুরুপত্র চ্ছেদন প্রকার, যতি সন্ন্যাসিপত্র চ্ছেদন প্রকার, ভৃত্যপত্র চ্ছেদন প্রকার, রিপুপত্র চ্ছেদন প্রকার, পত্র প্রমাণ, শ্রীশব্দ নিরূপণৎ, পত্র রচনাক্রম, লেখন প্রকার, রাজপত্রে পদন্যাস, মন্ত্রিপত্রে পদন্যাস, গুরুপত্রে পদন্যাস, স্বামিপত্রে পদন্যাস, ভার্য্যাপত্রে পদন্যাস, পুত্রপত্রে পদন্যাস, সন্ন্যাসিপত্রে পদন্যাস, পিতৃপত্রে পদন্যাস, সামান্য ভৃত্যপত্রে পদন্যাস, পত্র গ্রহণ প্রকার, পত্র পঠন প্রকার, লেখন লক্ষণ, প্রাদ্বিবাক প্রমাণ ও শূদ্রজাতির রাজকার্য্য নিয়োগ দোষ, পুস্তকমান অর্থাৎ পরিমাণ, ভূমৌ লিখনাদি নিষেধ, ভিন্নপত্র মোক্ষণে নিষেধ, লেখনী পরিমাণ, শ্রীশব্দ বিচার, শব্দস্য প্রয়োগ, শ্রী প্রয়োজন স্থানানি

প্রথম কোষ্ঠে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
রাজপত্র প্রশস্তি আরম্ভ

প্রথম কোষ্ঠে তৃতীয় পরিচ্ছেদ:

মন্ত্রী প্রশস্তি, লেখন পাঠ, পণ্ডিত প্রশস্তি, গুরু প্রশস্তি, ভার্য্যায়াঃ স্বামী প্রশস্তি, ভার্য্যা প্রশস্তি, পিতরং প্রশস্তি, পত্রী পাঠ, পুত্র প্রশস্তি, পিতা পুত্রে তুল্যত্ব বিচার, স্ন্যাসী প্রশস্তি, ভৃত্য প্রশস্তি, অরি প্রশস্তি, বিবেকী প্রশস্তি, অঙ্কপল্লবী ভাষা

প্রথম কোষ্ঠে চতুর্থ পরিচ্ছেদ:

কীর্ত্তিবর্ণন শ্লোকারম্ভ, প্রীতি শ্লোক, পত্রনবিচ লক্ষণ, উরক্কানবিচ লক্ষণ, কুফিয়ানবিচ লক্ষণ, সৈন্য গণনা, নমস্কার প্রণাম শব্দ বিচার, প্রণাম লক্ষণাদি, নমস্কার, কায়িক নমস্কার, বাচিক নমস্কার, দণ্ড নমস্কার, দণ্ডবৎ অষ্টাঙ্গ নমস্কার, পঞ্চাঙ্গ নমস্কার, উগ্র নমস্কার

দ্বিতীয় কোষ্ঠে প্রথম পরিচ্ছেদঃ

রাজপ্রশস্তি এবং পাঠ, চাতুর্ব্বর্ণসম্ভূত ব্যক্তির উপাধি, রাজাকে মনুষ্য বুদ্ধিকরণে দোষ, মহিষী প্রশস্তি এবং পাঠ, সামান্য রাজপ্রশস্তি এবং পাঠ, বিপ্র মন্ত্রিপ্রশস্তি এবং পাঠ, ক্ষত্রিয়াদি মন্ত্রিপ্রশস্তি এবং পাঠ, ভৃত্যপ্রশস্তি এবং পাঠ, গুরু প্রশস্তি এবং পাঠ, গুরুপত্নী প্রশস্তি এবং পাঠ, গুরুমাহাত্ম্য বিচার, গুরু পরমগুরু পরাপর গুরু অভেদ, গুরু প্রতি মনুষ্যবুদ্ধ করণে দোষ, গুরু শব্দস্য ব্যুৎপত্তি, পুরোহিত প্রশস্তি এবং পাঠ, পণ্ডিত প্রশস্তি এবং পাঠ, সন্ন্যাসী প্রশস্তি এবং পাঠ, দশবিধ সন্ন্যাসী উপাধি ও লক্ষণ, পিতৃপ্রশস্তি ও পাঠ, পিতামহাদির প্রশস্তি ও পাঠ, পিত্রব্যাদির প্রশস্তি ও পাঠ, জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রশস্তি ও পাঠ, বিপ্র বালক শূদ্রাদির নমস্য বিচার, ন্যূন বয়স্ক পিতৃব্য অনমস্য বিচার, মাতৃ প্রশস্তি ও পাঠ, গুরুতরা স্ত্রীদিগের পত্র লিখন বিচার, পতি প্রশস্তি ও পাঠ, ভার্য্যা প্রশস্তি ও পাঠ, শিষ্য প্রশস্তি ও পাঠ, পুত্র প্রশস্তি ও পাঠ, বিবিধ প্রশস্তি ও পাঠ, পরনায়ক প্রশস্তি ও পাঠ, নায়িকা প্রশস্তি ও পাঠ

তৃতীয় কোষ্ঠে প্রথম পরিচ্ছেদঃ

মান্যত্বর কারণ বিচার, ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে সন্দিগ্ধজনের পত্র, মনুষ্যজাত পশু পক্ষী বৃক্ষ ও ব্রাহ্মণাদির পবিত্র ধারণ ও বিপ্রের কৃষিকার্য্য বিষয়ক পত্র

তৃতীয় কোষ্ঠে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

তদুত্তর পত্র, পরকীয় নাগরের পত্র, নায়িকার উত্তর পত্র,নায়িকার দ্বিতীয় পত্র, নায়িকার তদুত্তর পত্র, বৈরাগ্য পত্র, বৈষ্ণবীপত্র, পতিপত্র, স্ত্রীপত্র, মাতৃপত্র, কন্যাপত্র

তৃতীয় কোষ্ঠে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

বৈবাহিক পত্রঃ লগ্নপত্র, বাগ্‌দানেরপত্র, বিধি নিমন্ত্রণ পত্র, পুনর্ব্বিবাহ পত্র, পুরোহিতের পত্র, গুরুপত্র, রাজপত্র, উত্তরপত্র, সংস্কৃত গদ্য পত্র

চতুর্থ কোষ্ঠে প্রথম পরিচ্ছেদঃ

অভিযোগ পত্র, সম্বাদপত্র, ঘোষণাপত্র, প্রাপ্তি লিপির পাণ্ডুলেখ্য, প্রতিনিধি পত্র, বাদে নিযুক্তপত্র, উত্তরপত্র, প্রশংসাপত্র, বেতনপ্রাপ্তিপত্র, বিক্রয়পত্র, প্রত্যুত্তরপত্র, ঋণপত্রের দ্বিতীয় পাঠ, লগ্নক পত্র, প্রত্যুত্তরোত্তরপত্র, সাক্ষ্যাকর্ষণ পত্র, সাক্ষ্যবাকপ্রবন্ধ পত্র, নিস্পত্তপত্র, সাক্ষীর সত্যবাক কথনে ফলশ্রুতি, কোবালার পুরুষত্রয়ের নাম লিখনের বিচার

চতুর্থ কোষ্ঠে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

পুত্রদানপত্র, প্রার্থনাপত্র, নিয়োগপত্র, সুকৃতি, দানপত্র, গ্রাসাচ্ছাদন পত্র, কৃতাংশ পত্র, স্বীকারপত্র, পট্টকপত্র, অঙ্গীকারপত্র, ভারার্পিত পত্র

চতুর্থ কোষ্ঠে তৃতীয় পরিচ্ছেদ:

শোকজনক পত্র, শোকনাশক পত্র, নিরালম্বোনিষৎ পত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *পত্রকৌমুদী* (১৮৬৩)

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *পত্রকৌমুদী* বা 'নাম পত্রাদি লেখনের উপদেশক গ্রন্থ' আলোচনার সারতায় ও নমুনাচয়নের অভিনবত্বে অনন্য গ্রন্থ। আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে 'শ্রীযুক্ত অনরেবল্ ওয়ালটর্ সিটনকার তথা শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সঙ্কলিত'। ভূমিকায় অবশ্য রাজেন্দ্রলাল জানিয়েছেন কিছু আদর্শ পত্র তিনি নিজেও সংগ্রহ-সংকলন করেছেন। বইটি চার খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম খণ্ডে রয়েছে ব্যক্তিগত পত্র লেখার আদর্শ, দ্বিতীয় খণ্ডে পাট্যা, কবুলিয়ৎ প্রভৃতি পত্র বিষয়ক আলোচনা ও উদাহরণ, তৃতীয় খণ্ডে জমিদারি ও অন্যান্য হিসাব লেখার নিয়ম উপস্থাপন করা হয়েছে, চতুর্থ খণ্ডে আদর্শ পত্রের নমুনা চয়িত হয়েছে। মূলত শেষ খণ্ডেই সিটনকার সংগৃহীত পত্রাবলি স্থান পেয়েছে। তবে এর মধ্যে সাহিত্যকর্ম থেকেও উদাহরণ চয়িত হয়েছে। যেমন, রয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) *নীল-দর্পণ* (১৮৬০) নাটকের চিঠি। অবশ্য তা রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক কিছুটা সংশোধিত।

রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থের বিশেষ মূল্য এটির সারগর্ভ ভূমিকা। তিনি বাংলার পথিকৃৎ পর্যায়ের ইতিহাসকার; সব বিষয়েই তাঁর আগ্রহ-অন্বেষা ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষে চিঠির প্রচলন-প্রকৃতি থেকে শুরু করে বিবর্তন নিয়েও কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পত্রশিক্ষার গ্রন্থাবলির মধ্যে বররুচি প্রণীত *পত্রকৌমুদী*ই ছিল সেরা; সম্ভবত সে কারণে ওই নামটি তিনি নিজেও গ্রহণ করেছেন। আদর্শ পত্র হিসেবে অনেকটাই সংস্কৃতানুগ থেকেছেন। তবে যুগের দাবি, সমাজ-জীবনের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে সচেতন মানুষ ছিলেন। তাই যথার্থই বলেছেন: 'এতদ্দেশে বাণিজ্যের যত বৃদ্ধি হইবেক, সময়ও তত বহুমূল্য হইবেক; সেই সময় লোকে নিষ্প্রয়োজনীয় বাগাড়ম্বরে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না; সুতরাং দীর্ঘপাঠ ত্বরায় পরিত্যক্ত হওয়াই বিহিত।" (রাজেন্দ্রলাল, ১৯০৪: ভূমিকা)

মোহাম্মদ জমিরুদ্দিনের *বিশুদ্ধ খতনামা* (১৯০৩)

*পত্রকৌমুদী*র ভূমিকায় বররুচি প্রদত্ত নিয়মরীতির উল্লেখের পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন: 'অধুনা পত্র লিখিবার এই সকল নিয়মের অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় মুসলমানেরা পত্রের পরিমাণ ও রঞ্জন বিষয়ে অদ্যাপি মনোযোগী আছে; কিন্তু হিন্দুসমাজে তাহার আর কোন অনুধাবন নাই।' (রাজেন্দ্রলাল, ১৯০৪: ভূমিকা) কিন্তু উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষায় মুসলমান রচিত পত্রশিখনের বই পাওয়া যায় না। অথচ আমরা দেখেছি, এ-জাতীয় গ্রন্থরচনাকালে হিন্দু লেখকদের কেউ কেউ মুসলিম শাসন থেকে শুরু করে মুসলমানদের বিদ্যা বিষয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। আর তারই সূত্র ধরে পত্র লেখায় পুরাকালের গঠন-প্রকৃতি ও ভাষাভঙ্গি চর্চার চেষ্টা চালিয়েছেন। যদিও মুসলিম শাসনামলে এবং রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে চিঠির প্রচলন লক্ষযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবু দীর্ঘ দিন মুসলিম লেখকেরা যে পত্রশিক্ষার পুস্তক রচনা করেননি, তার কারণ বিবিধ হতে পারে। প্রথমত ফারসি ভাষায় পত্রলেখার বই সুলভ ছিল। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে থাকার কারণে মুসলমানদের একটি বড় অংশে চিঠির প্রচলন সেভাবে শুরু হয়নি। ক্রমেই পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে থাকে। সব মহলেই পত্র ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এ-পর্যায়ে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হলো মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন (আলোচ্য সংস্করণে নামের বানান 'মোহাম্মদ' রূপে লিখিত হয়েছিল) লিখিত *বিশুদ্ধ খতনামা* অর্থাৎ মোসলমানি পত্রাদি লিখিবার পাঠ; আখ্যাপত্রে লেখকের নামের পূর্বে বিশেষণ হিসেবে যুক্ত হলো 'ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচারক'।

ডিমাই আট পেজি ও ডিমাই বার পেজি এ দুই আকারের যথাক্রমে 'বিশুদ্ধ খতনামা' ও 'ছোট সাইজের খতনামা' নামে বেরিয়েছিল। ১৩১০ বঙ্গাব্দে 'প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছিলেন:

> বঙ্গভাষায় মোসলমানী পত্রাদি লিখিবার পাঠ সংক্রান্ত কোন পুস্তক না থাকায়, ঢাকা — ঘোনা নিবাসী আমার প্রিয় দোস্ত জোনাব মুন্‌সী মনিরুদ্দীন আহাম্মদ ও নদীয়া — দহকুলা নিবাসী মদীয় শ্বশুর জোনাব মুন্‌শী হাজী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবদ্বয় আমাকে খতনামা লিখিতে অনুরোধ করেন; আমি উক্ত সাহেবদ্বয়ের অনুরোধের বশবর্তী হইয়া জন সমাজে "খতনামা" প্রচার করিলাম। যদি ইহার দ্বারা বঙ্গীয় মোসলমান সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। (মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, ১৩৭৮: ৩)

উল্লেখ্য, ধর্মপ্রচার ও সে উদ্দেশ্যে লেখালেখির কারণে মুনশি মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) ও মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন সেকালের পরিচিত ব্যক্তিত্ব ও বাংলা গদ্যের ইতিহাসেও উল্লেখিত জন।

পত্রের নমুনা চয়নের পূর্বে 'পত্র লেখকদিগের প্রতি উপদেশ' দেওয়া হয়েছে ছয়টি ক্রমে। নমুনা হিসেবে মোট বিশটি চিঠি রয়েছে। ব্যক্তিগত পত্রগুলো 'শিরোনামা' ও 'পত্রের ভিতর লিখিবার নমুনা' — এ দুইভাগে দেখানো হয়েছে। যেহেতু আমাদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে এটি মুসলিম রচিত একমাত্র গ্রন্থ, তাই চিঠিগুলোর বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে:

১. 'দাদা, নানা ও তত্তুল্য লোকের নিকট', ২. 'দাদী ও নানী ইত্যাদির নিকট', ৩. 'বাপ, চাচা, শ্বশুর, মামু ও খালু ইত্যাদির নিকট', ৪. 'মামা, চাচি, খালা, ফুফু ও শ্বাশুড়ি ইত্যাদির নিকট', ৫. বড় ভাই ও বড় নিস্পতি [সম্বন্ধী] ইত্যাদির নিকট', ৬. 'বড় ভাবি ইত্যাদিকে', ৭. 'ছোট ভাই, ছোট নিস্পতি (শালা) ইত্যাদিকে', ৮. 'ছোট বহিন ও ছোট শালিকে', ৯. 'পুত্র ও ভাগিনা ইত্যাদিকে', ১০. 'ওস্তাদ ও পীর এবং তত্তুল্য ব্যক্তিকে', ১১. 'ছুটীর জন্য দরখাস্ত', ১২-১৩. 'স্ত্রীর নিকটে', এরপর ১৪. কাবিননামা, ১৫. তালাকনামা লেখার নিয়মের পাশাপাশি তালাক সম্পর্কে কিছু কথা যুক্ত আছে ১৬. লাইব্রেরি বরাবর, ১৭, ১৮. রেল, পোস্ট অফিসের বড়কর্তা বরাবর অভিযোগ জানিয়ে, ১৯. বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, ২০ 'ধর্ম্মসভার বিজ্ঞাপন'।

পত্রলেখকদের প্রতি উপদেশ দিতে গিয়ে ছেলেমেয়ের ইসলামি নাম দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পত্রপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'চিঠি পত্রে খোদার নাম না লিখাই ভাল, অনেক সময় পত্রাদি না পাক স্থানে পড়ে, তাহাতে খোদার নামের অসম্মান হয়। যদি খোদার নাম লিখিতে একান্ত ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পত্রের উপরে একটা দাঁড়ি বা এক লিখিলে মন্দ হয় না।' (মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, ১৩৭৮: ৬)

'ইসলাম শাস্ত্র বিরুদ্ধ' দাবি করে মুসলমানদের নামের পূর্বে 'শ্রী' লিখতে নিষেধ করা হয়েছে, পরিবর্তে 'নামের পূর্ব্বে মোহাম্মদ বা শেষে আহাম্মদ' লিখতে বলা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে 'বিবি' ও ছেলেদের ক্ষেত্রে নামের শেষে 'মিঞা' লেখা ভালো বলে মত দেওয়া হয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামের পূর্বে জোনাব, হজরত, মৌলবী বা মুনশী লেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে সংস্কৃতজ প্রত্যয়যোগে সম্বোধনে লেখা হয়েছে জোনাবেষু, বখেদতমতেষু, দোওয়াবরেষু ইত্যাদি। তবে যেখানে 'পীরে'র বরাবর লেখা চিঠিতে অতিরিক্ত প্রশস্তি নেই, সেখানে 'দোওয়াবরেষু' স্ত্রী পূর্ণরূপে সালাম দিয়ে তারও আগে কয়েক পঙ্‌ক্তি ফারসি ভাষায় প্রেমপ্রশস্তি যুক্ত করা কিছুটা কৌতূহলকরই বটে।

প্রথম প্রকাশের আট বছরের মাথায় ১৯১১ সালে *বিশুদ্ধ খতনামার* পঞ্চম সংস্করণ বের হয়। এর মাঝে ১৯০৭ সালে সাহিত্যিক মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) *পত্র ও দলিল লিখন শিক্ষা* নামের গ্রন্থ বের হতে দেখি। অর্থাৎ বাংলা পত্রলিখন শিক্ষা বই প্রকাশে মুসলমান সমাজও পুরোপুরি অংশগ্রহণ করল বিশ শতকের শুরুতে।

পুনশ্চ

পত্রকে প্রাথমিকভাবে শিল্প বলা চলে না। আত্মকথা বা ব্যবহারিক বক্তব্য প্রদানই এর প্রধান উদ্দেশ্য। তবে শিল্প তো নিজেকে সুষ্ঠু ও সৌন্দর্যমান করে প্রকাশের প্রচেষ্টা; পত্ররচনার সময় রচয়িতা সে কাজটিই করেন। এখানে আরো উল্লেখ্য,

শিল্পী-সাহিতিকদের মধ্যে পত্রলেখার বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়, হয়তো তা ওই দ্বিবিধ কারণেই। কাজেই চিঠি কেজো গদ্য ও সাহিত্যিক গদ্যের একটি মিলনস্থলও বটে।

তবে ব্যক্তিগত চিঠির ব্যবহার বর্তমানে অনেকটা সীমিত হয়ে পড়েছে প্রচলিত নানা প্রযুক্তির প্রভাবে। আর তাই এখন আর পৃথক বই নয়, শুধু বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বইতেই পত্রলিখনের নিয়মরীতি ও নমুনা থাকে। তবে যথারীতি পত্রশিখনের শুরুটাও হয়েছিল ব্যাকরণ ও রচনা থেকেই। এসব বিবেচনায় বাংলা গদ্যের উদ্ভব-বিকাশ ও বহুমুখী বিবর্তনের অন্তরঙ্গ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য এসব পত্রলিখন গ্রন্থ পাঠ-পর্যালোচনা প্রয়োজন। আমাদের প্রণীত এ রূপরেখাটি সেকাজে সহায়ক হতে পারে বলে ধারণা করি।

গ্রন্থপঞ্জি

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৩। *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন* (সম্পাদনা), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

আনিসুজ্জামান, ১৯৮৪। *পুরনো বাংলা গদ্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আলাওল, ২০০০। *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ১৮৪৫। *পত্রের ধারা*, শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

দোনা গাজী, ১৯৭৫। *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দৌলতউজির বাহরাম খান, ১৯৮৪। *লায়লী-মজনু*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

নারায়ণ চট্টরাজ ঠাকুর গোস্বামী গুণনিধি, ১৮৪৫। *পত্রচিন্তামণিগ্রন্থঃ*, প্রকাশক অনুল্লেখিত, কলকাতা।

পিয়ার্সন, জে. ডি., ১৮২৫। *বাক্যাবলী*, স্কুল বুক সোসাইটি, কলকাতা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৪৯ ব.। *জয়গোপাল তর্কালংকার, মদনমোহন তর্কালংকার*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা।

মুহম্মদ সিদ্দিক খান, ১৯৯৪। *মুহম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী-১ম খণ্ড*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ১৯৮৫। 'বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম তালিকা', *বাঙলা পত্রিকা : ভাষা ও সাহিত্য*, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, ১২৬৯ ব.। *বিজ্ঞানাঞ্জন*, মুদ্রণঃ চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্র, প্রকাশক অনুল্লেখিত, আহিরীটোলা, কলকাতা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ১৯০৪। *পত্রকৌমুদী*, স্কুল বুক সোসাইটি, কলকাতা।

রামরাম বসু, ১৮০২। লিপিমালা, ব্যাপটিস্ট মিশন, শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

রেভারেন্ড জেম্‌স্ লঙ্, ১৯৮৮। *আদিপর্বে বাংলা প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা*, মুহম্মদ হাবিবুর রশিদ অনূদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, ১৩৭৮। *বিশুদ্ধ খতনামা*, মোহাম্মদ সোলেমান এণ্ড ব্রাদার্স, কলকাতা।

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৬৩। *বাংলার পত্র-সাহিত্য*, ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রা.লি., কলকাতা।

Blumhard, J. M., 1880. *Catalogue of Bengali Prited Books of the Library of the British Museum*, London.

Blumhardt, J. M., 1910. *A Supplementary Catalogue of Bengali Printed Books of the Library of the British Museum*, London.

Halhed, Nathaniel Brassey, 1778. *A Grammar of the Bengal Language*, Hoogly in Bangal বৈদ্যুতিন উৎস: https://granthsouthasia.wordpress.com/sct/stc-p/ ২২.০৪.২০২২।